উড়ো ফোনের ফাঁদে

তৃষিত বর্মন

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

উড়ো ফোনের ফাঁদে ৯

জরাইকেলার মেঘনাদ ৪৭

উড়ো ফোনের ফাঁদে

মাথার ওপর ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে আকাশ। নীচে সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে শের শাহ-র জিটি রোড পড়ে আছে মরা অজগরের মতো নিশ্চল।

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যাচ্ছে দূর পাল্লার লরি। চলন্ত গাড়ির চাকা থেকে একট যান্ত্রিক শব্দ উঠে সুনসান প্রকৃতির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নির্মম দস্যুর মতো। মরা বিকেলকে অবহেলায় পিছনে ফেলে সময় এখন গুটিগুটি পায়ে সন্ধের মুখোমুখি।

হাতে পায়ে শিকারি চিতার ক্ষিপ্রতা। সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে ঢাল বেয়ে ভিজে রাস্তায় নেমে এল রুদ্র। ভিজে সপসপে উইন্ডচিটারের পকেটে ডান হাতটা ঢোকানো। বুকজোড়া চেন গলা পর্যন্ত টানা। সঙ্গে লাগানো মাথা ঢাকা টুপি। রুদ্রকে অনেকটা মহাকাশচারীর মতো দেখাচ্ছিল।

মরা আকাশে বাঁ-হাত তুলে সিগন্যাল দিতে দ্রুত সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে রুদ্রর পাশে এসে দাঁড়াল রশিদ। হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। পিঠে ঝোলানো একটা কালো বড়োসড়ো কিট-ব্যাগ। রুদ্র বলল, ব্যাগটা খুব সাবধান।

অনেকটা দূরে বীজপুরে টাউনের আলোগুলো সব জোনাকির মতো মিটমিট করে জ্বলছে। টর্চ না জ্বেলে লাইটারের আলোতে কবজি উলটে ঘড়ি দেখল রুদ্র। পৌনে সাতটা বাজে। ঠিক সাতটায় বীজপুর থানায় ফোন করার কথা হাতকাটা বিল্টুর। স্পটে পৌঁছতে আরও মিনিট সাতেক।

রুদ্র দ্রুত মনে মনে হিসেব কষছিল। মিনিট পঁচিশ সময় তার হাতে আছে। এখান থেকে 'গিরি ময়দান' হাঁটা পথ বড়োজোর সাত-আট মিনিট। ঘড়ির কাঁটার মতোই নিখুঁত কাজ পছন্দ রুদ্রর। জিটি রোডকে আড়াআড়ি পার হয়ে গোয়ালাদের খাটালের পিছনের অন্ধকারে নামল ওরা দুজন।

মাথার ওপর ছাই ছাই আকাশ। তার নীচে গিরি ময়দানের জমাট অন্ধকারের কোলে ভূতের মতো দাঁড়িয়েছিল বাকি চারজন। ভোম্বল, জগা, আলতাফ আর নুলো গণেশ।

বীজপুর বড়ো জংশন স্টেশন। দূরে সাইডিং-এ কয়লা বোঝাই মালগাড়িগুলো শানটিং করছে ঘটাং ঘটাং শব্দে। চারপাশে বড়ো বড়ো কৃষ্ণচূড়া, আমলকী আর ঘোড়ানিমের গাছগুলো প্রেতের মতো ঘিরে আছে ময়দানকে।

নীচের যে রাস্তাটা হাসপাতালকে বাঁ-হাতে রেখে সোজা চলে গেছে বীজপুর টাউনের দিকে, সেখানে দু-একটা গাড়ির আলো কদাচিৎ চোখে পড়ে। আজকের শিকার আসবে ওই পথেই।

মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে তীক্ষ্ণ শিসের মতো একটা আওয়াজ করল রুদ্র। সে শব্দ গাছে গাছে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ময়দানের অন্ধকার কোণ থেকে তার প্রত্যুত্তর ভেসে এল বাদলা হাওয়ায়। নিশ্চিন্ত রুদ্র আর রশিদ সেই আওয়াজ বরাবর পা চালাল।

আজ বোধ হয় অমাবস্যা। অন্ধকারের পাহাড় ঠেলে ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর যেতেই অশরীরী ছায়ার মতো আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা চারজন।

প্রত্যেকের হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। ঢোলা গেঞ্জির আড়ালে তলপেট ছুঁয়ে গোপন অস্ত্র। সারা মাঠ জুড়ে জোনাকির আলোগুলো চমকে চমকে উঠছে কোন অজানা আশঙ্কায়। কৃষ্ণপক্ষের ভূতুড়ে আলো ছড়িয়ে আছে গিরি ময়দানের আনাচেকানাচে।

রুদ্রর চোখ বোধকরি অন্ধকারেও জ্বলছিল। চাপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল জগাকে, শালা আসবে তো রে? মালটা কিন্তু বহুত ঘোড়েল আছে।

ভৌতিক আলোয় হিসহিসিয়ে উঠল নুলো গণেশের গলা,

হারামিটাকে আসতেই হবে। দুগ্গা পুজোর এখনও একমাস বাকি রুদ্রদা। কিন্তু দ্যাখো, এখনই বিসোজ্জনের ঢাক বাজছে আমার বুকে। মাইরি বলচি।

গণেশের কথা শুনে খিক খিক করে হেসে উঠল ভোম্বল, বললে শুয়োরের বাচ্চাটাকে খচ্চা করতে এসে শালা কাব্যি করচে দেখো। ঝেড়ে একটা লাথ কষাও তো রুদ্রদা।

হসপিটাল বিল্ডিং-এর আড়াল ছেড়ে একটা জোরালো আলো ছিটকে বেরতেই মুহূর্তে বোবা হয়ে গেল ছ'-ছটা মানুষ। দুটো বিশাল ঘোড়া নিমের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেল পলকের মধ্যে। সুনসান মাঠের হাওয়ায় একটা শীত-শীত ভাব। জিপটা চক্কর মেরে ময়দানের মাঝবরাবর এসে দাঁড়াল।

অন্ধকারে একহাত তফাতের মানুষ নজরে পড়ে না। তবু পুলিশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃথাই একবার সে অন্ধকারে জরিপ চালিয়ে জিপ থেকে নেমে এলেন বীজপুর থানার জাঁদরেল ইন্সপেক্টর হিমাংশু হালদার।

এই সুন্দরগড়-বীজপুর-পায়রাসোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে গত তিন বছর ধরে তিনি মদমত্ত হস্তীর মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। রুদ্রদের 'ব্যাবসা-বাণিজ্য' সব লাটে ওঠার জোগাড়। হিমাংশু চাপা গলায় বললেন, হেডলাইট দুটো নিভিয়ে দাও তো শংকর।

ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে চাপা গোঙানির মতো একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটাকে লক্ষ করে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন হিমাংশু হালদার। নির্জন মাঠে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া তাঁর মুখে-চোখে ঝাপটা মেরে গেল। কই, কেউ তো কোথাও নেই? উড়ো ফোনটা তাহলে কে করল? তবে কি এটা ...।

একটা হিমেল স্রোত তাঁর শক্তপোক্ত শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে টের পেতেই চকিতে হিমাংশুর ডানহাতটা চলে গেল সার্ভিস রিভলভারের কাছে। পিছন থেকে ড্রাইভার শংকর বলল, অন্ধকারে একলা আর এগোবেন না স্যার।

সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে, যারা হাজার বিপদের মধ্যেও নিজের মিথ্যে অহমিকাটুকু কৃপণের মতো আঁকড়ে থাকতে চায়। নিজের ক্ষতি হতে পারে জেনেও।

চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে মিথ্যেই কিছু দেখার চেষ্টা করলেন হিমাংশু। তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎই নিস্তব্ধ, অন্ধকার ময়দানের চারপাশ থেকে এক ঝাঁক সুতীব্র আলো ঝলসে উঠল ইনস্পেকটর হালদারের চোখে মুখে। ইউনিফর্মের চকচকে পেতলের বোতামগুলো ঝিকিয়ে উঠল সে আলোয়।

দু-হাতে চোখ-মুখ আড়াল করতে করতে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন হিমাংশু, কে, কে আলো ফেলছে মুখে? কার এত বড়ো সাহস?

আলোর পিছনে জমাট অন্ধকারের ভেতর থেকে হিসহিসিয়ে উঠল রুদ্র চৌধুরির

গলা, তোর বাপের রে শালা! ছ'ছটা টর্চের তীব্র আলো ঘোলাটে আকাশের নীচে যেন রোশনাই জ্বালিয়ে দিল গিরি ময়দানের বুকে।

উড়ো ফোনের ফাঁদে পড়ার আঁচটা যখন শেষবারের মতো তাঁর চেতনাকে ছুঁয়ে গেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রিভলবারের বাঁটে হাত পৌঁছবার আগেই এক ব্যাগ-ভর্তি তাজা বোমা নির্ভুল লক্ষ্যে এসে পড়ল হিমাংশু হালদারের গায়ে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সমস্ত বীজপুর টাউন। আর দোর্দণ্ডপ্রতাপ, অকুতোভয় ইনস্পেকটর দশাসই শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে রইল গিরি ময়দানের অন্ধকার মাঠে।

॥ দুই ॥

বীজপুর বাজার এলাকা থেকে যে রাস্তাটা 'দশকর্মা ভাণ্ডার'কে বাঁ-হাতে রেখে শ'খানেক গজ গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা ডিপোটার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তারাই উলটো দিকের পুরোনো দোতলা বাড়িটা তরুণ গুহর ঠেক। নামে বিরোধী দলের একটা আলাদা আঞ্চলিক অফিস আছে বটে, তবে এখানে বসেই দলের যাবতীয় মিটিংমিছিল, বিক্ষোভের খসড়া তৈরি হয়।

পায়রাসোল-বীজপুর-সুন্দরগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার শ্রমিক বেল্টে কিংবা কনট্রাক্টর মহলে এখনও যে বিরোধীপক্ষের ছিটেফোঁটা অস্তিত্ব রয়ে গেছে, তার সব কৃতিত্বটাই তরুণ গুহর প্রাপ্য।

ক্ষমতাসীন শাসকদল যেনতেনপ্রকারেণ তরুণ গুহর এই প্রতিপত্তি খর্ব করে নিজেদের নিষ্কণ্টক করতে বদ্ধপরিকর। সেই পরিকল্পিত ব্লু-প্রিন্টের নিটফলেই আজকের রুদ্র চৌধুরি, জগা দত্ত, রশিদ খানেদের জন্ম।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি আলাদা একটা মতাদর্শ নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন তরুণ গুহ। নিজের আখের বলে কিছু ছিল না তাঁর। তাই বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মতো সেটা গুছিয়ে তোলারও প্রশ্ন ছিল না। যেটুকু করেছেন, কোনও প্রত্যাশা নিয়ে নয়, দলকে ভালোবেসেই করেছেন।

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়, প্রশাসনিক মদতে বলীয়ান রুদ্ররা খুব সহজেই বীজপুর-পায়রাসোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের পুরো কনট্রাক্টরি সিস্টেমটাই কবজা করে নিয়েছে। ফলে ভাঙনের একটা চোরা স্রোত ভেতরে ভেতরে দলকে গ্রাস করে ফেলছে অনিবার্য পতনের মতো।

রাত এখন আটটা। দোতলা বাড়ির নীচের ঘরে টানা ফরাস পাতা। জনা তিরিশেক দলীয় সদস্য গোল হয়ে বসে। বীজপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার এক চরম সন্ধিক্ষণে সকলেরই চোখেমুখে একটা মরিয়া ভাব।

সুখেন অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল। স্বদেশ ফিশফিশ করে পাশে বসে থাকা বিজনকে বলল, তরুণদার সঙ্গে আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে মাইরি। এভাবে পড়ে পড়ে আর কদ্দিন মার খাব, বলতে পারিস?

শালা, রুদ্রর দল সব ধান্দা করে লাল হয়ে গেল। আর আমরা ফায়দা না দেখে শুধু ভাষণ কপচাচ্ছি।

তরুণ গুহ নিচু গলায় কথা বলছিলেন তাঁর বহু দিনের ঘনিষ্ঠ অনুগামী জাভেদ আখতারের সঙ্গে। মরিয়া সুখেন গলা তুলে বলল, তনুদা, আমাদের কিছু কথা আছে।

এভাবে যে আর দলের কাজ চালানো যাবে না, তরুণ গুহ তা বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন। দলের মধ্যে বিভ্রান্তি তো আছেই। হিমাংশু হালদার খুন হওয়ার পর স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষও তাঁর নিরাপত্তার কোনও দায়দায়িত্ব নিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই সব চিন্তাভাবনার ফাঁকে তরুণ গুহ জাভেদকে ছেড়ে ঘুরে বসলেন সুখেনের মুখোমুখি। বললেন, আমরা তো পরস্পর মত-বিনিময় করব বলেই আজ এখানে সবাই জড়ো হয়েছি। বলো, তোমার কী বলার আছে?

সুখেন সরাসরি তনুদার মুখের দিকে তাকাল না। দেওয়ালে টাঙানো প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর গলার রঙিন কাগজের মালাটা পাখার হাওয়ায় দুলছিল। না তাকিয়েও সুখেন বুঝতে পারছিল ঘরের সব ক-টা চোখ এখন ওর মুখের ওপর। তবে এটাও সে নিশ্চিত জানে, তনুদাকে ও আজ যে কথা বলবে, সেটা উপস্থিত সকলেরই মনের কথা।

সুখেন বলল, খালি পেটে সারাদিন লেবার কনট্রাক্টরদের পিছনে ঘুরে আখেরে